দৈনিক বাংলা

তারিখ 11 JAN 1988
পৃষ্ঠা 5 কলাম 3
012

লেখাপড়ার বন্ধ দুয়ার

স্কুলে ভর্তি হওয়া শিশুদের কাছে এক মস্তবড় স্বপ্ন। কিন্তু আমাদের দেশে ক'জন শিশুর জীবনে এ স্বপ্ন সত্য হয়? আমাদের শিশুরা কেউ ফাল্গুনের ঝরাপাতা কুড়ায়, ডাস্টবিনে উচ্ছিষ্ট ঘাটে, বাজারের 'মিনতি' হয়, সংসারের সাত-পাঁচ কাজ করে, অন্যের খাদ্যভর্তি টিফিন ক্যারিয়ার বয়ে নিজের খাদ্য যোগাড় করে।

আরও ছোট্ট শিশু মায়ের ইঁট ভাঙ্গার সঙ্গী হয় অথবা পূর্ণ পানির পাত্র বহনের। এরা জীর্ণ সংসারের অর্থ আয়ের উৎস. স্কুলের জন্য আবদার ধরার অথবা স্কুলে গিয়ে পড়তে-বসার সময় কোথায়?

কেবল কি সময়?

স্কুলে কি এমনি এমনি যাওয়া যায়? তার রসদ কই? এই মাটির পৃথিবীতে সোনালী স্বপ্ন দেখতে গেলে রাশি রাশি রজত মুদ্রার প্রয়োজন হয়। সে মুদ্রা সকলের লভ্য নয়।

এই তথ্যও নতুন নয়। বারে বারেই উচ্চারিত হয়েছে এসব, চুলচেরা বিশ্লেষণে লিপিবদ্ধ হয়েছে যতো কঠোর সত্য। সমাধানের সম্ভাবনা আজও দেখা যায়নি—বরং সংকট বাড়ছে দিনকে দিন। 'শিক্ষা' বিষয়টি আজ মোটামুটি সঙ্গতিশীলদেরও নাগালের বাইরে চলে যাচেছ, শিক্ষার উপকরণ, বেতন ও আনুষঙ্গিক মিলে যে বিপুল ব্যয়ের অংক দাঁড়াচেছ তাতে করে এ অনেকটা বিলাসিতার পর্যায়ে পেঁাছুচেছ। মেধাবী শিক্ষার্থীদেরকেও আজকাল প্রাইমারী কিংবা জুনিয়র স্তর শেষে স্কুল ছাড়তে দেখা যাচেছ। এসএসসির পরে বাদ পড়ে আরও একটি বিশাল অংশ, বাদ পড়ে পাস যারা করে, তাদের অনেকেও। এইচএসসির পর উচ্চশিক্ষার পথ তো এখন একটি অতি ক্ষীণ গোষ্ঠীর জন্য। এই উচ্চশিক্ষায়ও স্বাভাবিক প্রবাহ অন্তর্হিত; সেসনজট-এ অবরুদ্ধ হয়ে থাকতে হয় বছরের পর বছর। যারা পারে, সে কোনও ভাবেই চলে যায় বাইরে; অবিত্তবান ঘরের সন্তানেরাও বহির্জগতটাকে মোক্ষ ভাবছে নিরুপায় হয়ে; জমি-বেচে সর্বস্ব খোয়াচেছ; প্রতারকের ফাঁদে পড়ে, নয়তো কলা-কৌশল প্রয়োগ করে দেশ ছেড়ে যেতে সক্ষম হলেও বিভূঁয়ে গিয়ে বিপাকে পড়ছে। নাজেহাল হচেছ। জীবনের জন্য স্বপ্ন দেখতে গিয়ে জীবনের কাছে অবমানিত হচেছ। হতাশা, ক্লান্তি, বেদনা শুধু মাত্র একজনকে নয়, শুষে খাচেছ তার পুরো পরিবারকে।

কিন্তু এসব অনেক পরের। শুরুটাও বা কোন সুখের? চাইলেই কি স্কুলে ভর্তি হওয়া যায়? প্রতিযোগিতার প্রচন্ডতা ডিঙ্গিয়ে, অবিশ্বাস্য প্রতিবন্ধকতা এড়িয়ে স্কুলের একটি সীট লাভ সম্ভব কতোটা? স্কুলগুলোর-ও বেপথু দশা—কোথায় চাহিদার সিকিভাগ-ও জায়গা? জায়গা নেই বলেই প্রশ্নপত্র কঠিন করতে হয়, ছোটো ছোটো শিশুদের ভর্তি পরীক্ষার নামে অগ্নি-পরীক্ষায় ফেলতে হয়। ভর্তি হতে গেলে সব জানতে হবে, সব। তার নিজের ও পরিবারের নাম ঠিকানা উৎস বৃত্তান্ত, দেশ-বিদেশের সীমানা মানচিত্র, কাকাতুয়া, ময়ূর, রয়েল বেঙ্গল, সোনালি আঁশ, কাগজের কল, ক্রিকেট-ফুটবল, মেঘ-বৃষ্টির কারণ, আকশের রঙ—সব নখ-দর্পণে থাকতে হবে, তারও পরে 'ভাগ্য'কে মানতে হবে—মেনে নিতে হবে ভর্তি না হতে পারাকে।

অথচ প্রশ্ন তোলা যায়, ভর্তি পরীক্ষা লাগে কেন? এ তো সুপিরিয়র সার্ভিস নয়, এ তো পদোন্নতির বিষয় নয়—নয় নতুন চাকরির ব্যাপারও। নির্ধারিত বয়স হলেই স্কুলে ভর্তির অধিকার জন্মে যায়, পড়াশোনা জ্ঞানার্জন তো স্কুলে হতে হয়। আগে ভাগে যা দেখার, তা হচেছ, শিক্ষার্থীর মান, মন, পছন্দ, প্রবণতা—এসব; যার কল্যাণে তাকে ক্লাসে নির্দেশনা সম্ভব। সম্ভব তার জন্য শ্রেণী নির্বাচন। কিন্তু তা না হয়ে হচেছ উল্টোটি। ঘরে থেকেই সব বিদ্যে মগজে নিয়ে আসবে ছেলে, ভর্তি পরীক্ষায় ঝুড়ি-ভর্তি নম্বর পাবে—তবেই তার জন্য ভর্তির শিকে ছিড়বে। কেবল তাই নয়, ভর্তি লটারীতে না টিকলে লাগবে অন্যান্য, যেমন মামা-চাচার পরিচয়, বংশ ও মর্যাদার কৌলীণ্য। প্রভাব প্রতিপত্তির খেল এখন শিক্ষাঙ্গনেও। টেলিফোন ও পত্র—এ দুটোর যদি তেজ বা ওজন থাকে, তবে কাজ হলেও হতে পারে, নইলে সহজ নয়—যতোই মেধার আধিক্য থাকুক না কেন।

অর্থাৎ ঠাঁই না-থাকা অবস্থায় যেভাবে ঠাঁই করতে হয়, ঠিক তাই। ফন্দি-ফিকির, কলাকৌশল, অনুনয়-অভিনয়,—অস্ত্রের অভাব নেই। প্রয়োজন মাফিক প্রয়োগ চাই।

যাদের কোনও হাতিয়ার নেই, তারা ভর করেন শিশুর সামর্থ্যের ওপর। যেন মরণপণ করেন, যে করেই হোক, বানাবেন ওকে দিগ্গজ। ভাষা না ফুটতেই অক্ষর জ্ঞান, হাঁটতে না শিখতেই সাধারণ জ্ঞান। কিছু বুঝতে না শিখতেই শিল্পকলা বিজ্ঞান—অভিভাবকের প্রয়াস অন্তহীন। লক্ষ্য, স্কুলে ভর্তির যোগ্য করে তোলা। যেহেতু ধরাধরির লোক নেই। নেই ক্ষমতা চাপ সৃষ্টির। অগত্যা শিশুকেই করতে হবে মেধাবী। শিশু যদি অপারগ হয় তথাকথিত 'মেধাবী' হওয়ার প্রস্তুতির সঙ্গে তাল দিতে—তাকেই শাসনে নির্যাতনে দায়ী করা হয়, করে পরিবারকে এক ধরনের সান্ত্বনা পেতে হয়।

এ এক আশ্চর্য ব্যাপার।

কচি শিক্ষার্থীদের জন্য এ পৃথিবীটাই যেন বিরাট পরীক্ষাগার। কি কিন্তু কেন বোঝার আগেই তার ললাটের লেখা তৈরি হয়ে যায়? প্রাথমিকভাবে পরিবারের আর্থিক অবস্থা ও সামাজিক অবস্থান তার ভাগ্য নির্ণয় করে দেয়। এর পরে ভিড়ের মাঝের একজন হয়ে সে হারিয়ে যায়। তার সুপ্ত সম্ভাবনা মারে খায়, পদে পদে ঠোকর খেতে খেতে আত্মবিশ্বাস হারায়, ছোট্ট একটি অংশের শিক্ষার্থীদের জৌলুস দেখে দেখে নিজেকে অপদার্থ হিসেবে মেনে নেয়।

বড়দের ব্যর্থতা ছোটদের ওপর চাপে। ছোটরা জানে না—ঢাকার গুরুত্ব কেন দিনকে দিন বাড়ছে, জানে না কেন ঢাকার জনসংখ্যা দ্রুত বেড়ে চলেছে, বোঝে না কেন স্কুলের সংখ্যা বাড়ানো হচেছ না জন-চাহিদার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে। স্কুল হলেই তো হয় না, ভালো স্কুল, ভালো মানের স্কুল। সব স্কুল যদি সমান হতো, তবে নিশ্চয়ই ভার লাঘব হতো। স্কুলে স্কুলে যে বৈষম্য—তা প্রকটভাবে ছাপ ফেলে অভিভাবকদের মনেও। ভালোকে সবাই চান—এ জন্যই অনেকে বিশেষভাবে প্রাধান্য প্রাপ্ত বিদ্যালয়ে সন্তানকে ভর্তি করতে মরিয়া হন—মরিয়া হয় একটু বুঝতে-শেখা ছাত্র নিজেও।

সব কিছু মিলে, সব উদাসীনতা ও বৈষম্য নিয়ে স্কুলের পরিস্থিতি এখন করুণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ নিয়ে বলাবলি হয়, আলোচনা হয় বছরের একটি বিশেষ সময়ে; বলা চলে বিষয়টি সমস্যা হয়ে আসে আবর্তক ভিত্তিতে। তারপর ধামাচাপা পড়ে।

চাপাপড়া উচিত নয়। সময় এসেছে, এখন এর জন্য কার্যকর পন্থা উদ্ভব না করলেই নয়। আরও বিদ্যালয় দরকার—দরকার বিদ্যালয়ের শ্রেণীবিন্যাসে সমতা আনয়নের।

নইলে বিড়ম্বনা যে বাড়বে কেবল তা-ই নয়, ছোট অবুঝ নির্মল সুন্দর মনগুলো স্বপ্ন রচনা করতে ভুলে যাবে, সে স্বপ্ন প্রকৃতপক্ষে আশার আলো বড়দের জন্যও।

—হোসনে আরা শাহেদ